বরুণ ঘোষ সম্পাদিত

আলোকিত সমাবেশ

সাহিত্য-প্রয়াসী

ইংরাজী ১১ সেপ্টেম্বর/১৯৪৫
প্রকাশক : শ্রী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক/সাহিত্য-প্রয়াসী
৪৫, যাদব দাস লেন/হাওড়া/২
পরিবেশক : পাণ্ডুলিপি
৪৫/১/১, কালীকুমার মুখার্জী লেন/শিবপুর/হাওড়া/২
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : শ্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস। কলিকাতা-৯

কাব্যরসিকেষু—

অমূল্য ভূষণ পাল

[সুদর্শন চেহারার সঙ্গে কবিতার যেন একটা আপোস আছে। এককালে হাওড়ার বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পুরোধা ছিলেন। এখন কিছুটা সাংসারিক, কিছুটা সামাজিক দায় দায়িত্বের কুণ্ডে আবদ্ধ। তা হ'লেও সত্যিকার ভালো কবিতা এখনো লিখতে সক্ষম। বস্তু ঘটনার ভিড় ঠেলে গভীর আন্তরিকতায়, সংবেদন আর সচেতনার সাজুয্যে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এঁর কবিতার মুখ। অর্থাৎ বক্তব্যে ইনি ছুঁতে পেরেছেন মননের স্থিতধী পরিণতি, প্রকরণেও দেখিয়েছেন স্পষ্টীকৃত অগ্রগতি।]

ছবি ঃ নিরুত্তর

তাল তাল অন্ধকার ঘাড়ে করে,
ফাঁপানো ফানুসগুলোর পেট ফাঁসিয়ে,
অস্তিত্বে অনাস্থার আগুন ছুঁইয়ে,
এক ঝাঁক ফতুর দামাল
উদ্‌ভ্রান্ত আকাশ জুড়ে
প্রশ্ন করেছিলো—
কেন এ জীবন !!!

অভ্রান্ত মোহান্ত ধূর্ত বৈষ্ণব বণিক
উন্নাসিক ইতিহাস, শশব্যস্ত সময়-সুযোগ
মহাশয় মহাজন
গা বাঁচিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেছে।
বধ্যভূমি বাঁয়ে রেখে—
দেয়নি উত্তর !

চাপ চাপ রক্তের অরণ্য মাড়িয়ে
চিড়কার রোদ্দুরে জ্বলে পুড়ে খাক্
ঝাঁক ঝাঁক ফতুর দামাল
চোরাগোপ্তা হননের প্লাবনে পা রেখে
আবার ধিকৃত প্রশ্নে আকাশ ফাটালো—
কেন এ মরণ !!!

সন্তর্পণে পাশের গলিতে পিছলে পালালো
নিরুত্তর সভ্যতার সম্ভ্রান্ত বিবেক ;
তাল তাল বোবা অন্ধকার
তল্লাট আগলে ছিল—
দেয়নি উত্তর !

দাস্য অভ্যাসের

ধ্বনি-প্রতিধ্বনির প্রেমিক নার্সিসাস ব্যস্ত ইদানিং
কৃপণ সময়ের বরাদ্দ রেশনে
দিনের দাসত্বে লীন 'হা হতোস্মি' খাঁচার অধীন
বীতস্পৃহ মন-মেজাজ অনবচেতনে ;
একমাত্র অবশিষ্ট রাতে-দিনে বার দুই তিন
নিজেকে তিলেক রাখা অর্পিত দর্পণে।

যেমন বদভ্যেস হাপিত্যেস্ চোখকান পেতে রাখা
সময়ের প্লাবনের আগুনের স্রোতে—
উঁহু! আহা! কণ্ডুয়ণ! জয়োল্লাস! অট্ট ইউরেকা!
উত্থানে-পতনে বা ফুটবল-রেসের বাজীমাৎ-এ ;
অর্বাচীন নির্বাচনে খুলে দিই চামড়ার আংরাখা,
অভ্যাসের চা-বিড়িতে লালকেল্লা ফতে !

অভ্যাস দ্বিতীয় সত্তা. আহার-বিহার-নিদ্রা ইত্যাদির,
আবেগের নদীবেগে স্নানের অভ্যেস ;
তেলেভাজা টাট্‌কা গরমে পরমার্থ ক্ষুন্নিবৃত্তির,
আবাল্য বেলুনে কিনি সম্পান্ন আমেজ
সম্প্রতি সেন্‌সেশন্ অভিযান মঙ্গল যাত্রীর,
অথবা সর্বশেষ রক্তক্ষরা বাংলাদেশ।

কা কস্য…

শেষ রাতের খৈ-ছড়ানো বৃষ্টিতে
বাসি মুখে জল ছিটোলো শহুরে সকাল

চাকায় তেল দাও, ওঠো।
গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলো
ট্রাফিকের টিক্‌লি-আঁটা চৌমাথায়।
সুরু করো এক পয়সার পাঁচালী।
যাত্রীরা কেটে পড়েছে।
হোয়াইটঢ্যাওয়ের টাওয়ার ঘড়িটা
কুচিয়ে কাট্‌ছে সুযোগের
মিনিটগুলোকে,—ওঠো।

উঠলোনা!
বুঝি ঘেন্নায় মুখ ঘোরালো এদ্দিনে,
বিরাট বক্তার, বিরাট নেতার
তর্জনী উচানো ব্রোঞ্চমূর্তির মুখে
রাত তুপুরে কখন
তিন তুড়ি ঠুকে
বুড়ো আঙুল নাচিয়ে
সব বালাই চুকিয়ে
সে গুছিয়ে শুয়েছে!

শুধু রেলিঙে ঠেস্‌ দেওয়া
আশৌচ পাওয়া লাঠিটা
অগস্ত্যশিষ্যের বিকল্প ভূমিকায়
এখনও একরোখা!

গোত্রান্তর

অনেককাল কলতলায় জল তুলেছে
সকাল বিকেল,
গিন্নী দুপুর পাশ ফিরে শুলে
দুষ্টু হাতের টানে
হতে চেয়েছে খিলখিলে ফোয়ারা,
শেষ উনুনের ক্লান্ত কয়লাগুলোর
মাতাল চোখে জল ঢেলেছে অঢেল।

তারপর দিনকালের উপেক্ষায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে
পেশাদার বেকার আমরা
ডালহৌসির ডালে ডালে
দারোয়ান দুপুরগুলোকে যখন ঢিল ছুঁড়েছি,
সেই ফাঁকে এই বৃদ্ধ বেকার
মরচে মলিন ক্লিষ্ট কাঠামোটা টেনে টেনে
কামারশালায় 'কিউ' লাগিয়ে
শানানো শলা চালানো
এ ফোঁড় ও ফোঁড় বুকপিঠ নিয়ে
তিনতাল মাটি ঘাড়ে এসে
একদিন কবর ঠেলে রুখে দাঁড়ালো
রান্নাঘরের রকে।
হঠাৎ এক ভোর পাঁচটায় দেখি
যে জল তুলতো, আগুন নেভাতো
সে আগুনে আঁচ নাচিয়ে তুলছে
লতানে নীল লেলিহ পাপড়িতে,
সঙ্গে সঙ্গতকার
হাভাতে এক হাত-পাখা,
আর কোন সতেরোয় সিঁদুর পুড়িয়ে ফিরে আসা
এ বাড়ির যমের অরুচি।

রাতভোর

যাদুকর রাত সারারাত ছবি আঁকে
আনত আকাশ অনুগত ক্যানভাস
গুণটানা নদী মোহানার বাঁকে বাঁকে
আমাদের কানে গান গায় বারোমাস।

কুয়াশার কোট গায়ে রাশভারী রাত
ভাস্কর হাত তারার আগুনে লাল,
অচেনা রংরেজিনি বোনে মৌতাত
স্বপ্ন শকট সড়কে টালমাটাল।

চুলখোলা ছায়া অবিন্যস্ত স্মৃতি
পদ্মকোরক স্তনাগ্র উন্মুখ,
চন্দনবনে কস্তুরী-মৃগ-রতি
প্লাবিত পৃথিবী চিত্রার্পিত মুখ।

নামধাম নেই নিখুঁত চিত্রকর
আঁকেজোকে লেখে রাতভোর বারোমাস
আমাদের বুক রংলাগা ক্যানভাস
রং তুলি মন কবিতার কারিগর।

আনবে বলো

জীবন বেজায় দুর্বিসহ
বাঁচতে কেউ চায়না,
তবু মরণভয় অহরহ
স্ব-বিরোধী বায়না॥

ঝাঁচার জন্য বাঁচতে কে চায়
মরার জন্য মরতে—
পুতুল নাচের সুতো নাচায়
লড়ার জন্য লড়তে॥

বাঁচার জন্য মরতে, অতি
ভীতু হলেও রাজী,
দাও জীবনের প্রতিশ্রুতি
জীবন দেবো আজই॥

জ্বলজ্যান্ত জীবন সে তো
প্রবাল দ্বীপের তুল্য
মরণ যখন স্তূপীকৃত
তামাম্ শোধ মূল্য॥

রক্ত দেবো ভরা কোটাল
বিপুল স্বেচ্ছামৃত্যু
আনবে বলো সোনার সকাল
খতম্ চিরশত্রু!!

পটভূমি

হাই তুলে হাইকোর্ট-ট্রাম থেকে নেমে
চাঁদপালে বাবুঘাটে থেমে
দিন আসে
হাটুরে পা ফেলে হেঁটে হেঁটে
কানঝোলা ছাগলের টুংটাং ছন্দের ঘুঙুটে
ফুটপাতে খড়ের ক্যাম্পে
চোদ্দতলা সেক্রেটারিয়েটে।

স্নানঘাটে ক্রমে
পুণ্যার্থী প্রাইভেট ঘিরে ভিক্ষার্থীরা জমে
চটকলে আটাকলে যাঁতাকলে দূরে
বাঁশী বাজে চিলেরা চ্যাঁচায়
'অমিতা' লঞ্চের ডেকে হুড়মুড় টইটুম্বুর
দিন যায়
জীবিকার ওপার গঙ্গায়।

কালো কোট আলো করে
ইডেনের শিশু কৃষ্ণচূড়া
পথপ্রান্তে সূচীমুখ গর্ভব্যথাতুরা
আর্তনাদ দাঁতে দাঁত চাপে—
এ্যাসেম্বলী-মিছিল বাড়ে বাড়ন্ত উত্তাপে।
পাশাপাশি আগে বাড়ে
ভাঁটার ঘোলাট গঙ্গা
হাওড়ার পোল পায়ে ঠেলে,
দিন চলে
সমুদ্রের নাম লিখে বন্দরের নোঙরে শেকলে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

[খুব অল্পদিন কবিতা লিখছেন—মাত্র চার কি পাচ বছর হোল কবিতার বয়স। বয়স আর সাধনার দিক দিয়ে তরুণ হলেও এঁর কবিতা ম্যাজিকের মতো যেন এক আশ্চর্য শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। কি কবিতার ফর্মে—কি ভাবনা-চিন্তায়—কি চিত্রকল্পে ইনি আধুনিক টেক্‌নিকটাকে পুরোপুরি আয়ত্তে এনেছেন। বক্তব্য যেমন সুন্দর, বাচনভঙ্গি তেমনি অভিনব। কবিতা ছাড়া সুন্দর ছোটগল্প রচনাতেও হাত পাকতে শুরু করেছে।]

আগামী সকাল

আগামী সকাল
আমার চেতনায় প্রহৃত সূর্য ;
আমার জাগরণে ঘুমের পৃথিবী ;
এবং অভীষ্ট আকাশ
আমার চেতনার মর্মমূল ।

আমাকে কেন কোনো সন্ধ্যেতে
ধূপছায়া পৃথিবী
ঝাঁপ মেলে দিল ;
এবং বসিয়ে রাখল,
সমস্ত রাত অলীক সময়েরা ।

এখন আমি শঙ্কিত প্রহর গুণে যাই ।
কেবলি আগামী সকাল,
প্রতীক্ষায় কঠিন ।

তোমার দরজার কপাট রঙ্‌ কর

তোমার দরজার কপাট রঙ্‌ কর
নীল রঙ্‌
সূর্যের আলো আসুক

তোমার দরজার কপাটে সারা সকালটা
সূর্যের আলো লেগে থাকবে।

দাঁড়িয়ে হোক বা ব'সে
কেবল হৃদয় মাপবে সারা বেলা।
হৃদয় মাপা যাবেই—
কারণ একখণ্ড অন্ধকার ভূমি
রোদ্দুর পৌঁছুবে।

তারপর আ-লো-হা—
দেখবে তুমি আমার হাত ধরে
আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ কি ?

শুধু দরজার কপাট রঙ্‌ কর
নীল রঙ্‌
সূর্যের আলো আসুক।

কখনো

জলাভূমি ;
নারিকেল গাছ দু-একটি
দূর দিগন্ত বাড়ী ;

আমি তোমাকে বাসনার
দু-চোখ মেলে খুঁজবো।

আমার ব্যস্ততার সমস্তক্ষণ মধ্যে
কেবল একটি সন্ধে ভালোবাসি।

যে সন্ধে-ক্ষণ ধূসর পাতার শব্দরা হয়
যে-বেদনা আমাদের
ধূসর পাতারা হয় কালের নীরিক্ষে।

আমরা কেবল একটি
সন্ধে ভালোবাসি।
আমি তোমাকে বাসনার
দু-চোখ মেলে খুঁজবো।

জীবন নির্বেদ শোকের বস্তু

বলি : জীবন শোকের বস্তু যদি হয়
ময়দানে বসে থেকে অন্তত
নক্ষত্র ছাখো সন্ধের।

এখন সময়ের প্রতিটি উদয়-সূর্য ম্লান হয়ে যায়।
জীবন অস্তমিত সূর্যকে
ভালোবাসে ব'লে,
কতদিন ছুটে যাবে ক্লান্ত সওয়ার সাজে ?

তার লাগাম-ছেঁড়া অদৃশ্য ঘোড়া হয়ত একদিন
চড়াই-উৎরাই, উৎরাই-চড়াই ছুটে
ধূসর তৃণক্ষেত পাবে।

তখন হয়ত জীবন,
একটা ভাঙা বাড়ীর মতন
সাপের গর্ত আর চামচিকির ছাত্‌না তলা হবে।

জীবনকে পিছনে ফিরিয়ে বলো যদি আস্তে চলো :
ডায়ে-বাঁয়ে ছুটো না অমন :
জীবন শুনবে না।

সে অস্তমিত সূর্যকে ভালোবেসে
চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যাবে।
একদিন জীবনের প্রাপ্য বস্তুভূমিতে
নোন্‌তা আস্বাদও পাবে।
কারণ, জীবন নির্বেদ শোকের বস্তু।

শব্দের ভেতরে

শোনো, আমাদের নিজস্বতা ক্রমশ
হারিয়ে যায়। অনেকটা পথ
তুমি হেঁটেছ, সেই সঙ্গে আমিও।
রাত আর মধ্যাহ্নের সূর্যের স্পর্শ
এতটাও পেয়েছো। অনেকটাই
আমার মত। সেই সঙ্গে স্মৃতি প্রহরের
দর্পিত পদক্ষেপ। কে বা কারা
যেন বলে : আর নয়, আমরা
দূরের মানুষ। আমরা শুনি
শব্দিত পাহাড়ের চূড়ায় অবরোহণের
মুহূর্তে। তুমি যন্ত্রণার সঙ্গে কিছুটা
ভাবতে বসো। আমিও বসি।
তখন আমরা দু'জনেই প্রান্তরের নিঃসঙ্গতায়
যেন নিজেদের নিজেরা চিনতেও পারি।

তারপর আমরা পরস্পর বলি :
আমরা আমাদের এবার দেখবো।
আমাদের নিজস্বতার ওই এতটুকুন
পরিধির আমরা নক্ষত্রের মতো স্থির হবো।

অথচ কে-বা কারা যেন বলে :
আর নয়, আমরা দূরের মানুষ।
অর্থাৎ স্মৃতি প্রহরের দর্পিত পদক্ষেপের পর
মনে হয়, আমরা নিজস্বতা হারিয়েছি।

মাইনাস

দেখবে ট্রাকের দৌড়ে আমরা কোনোদিনো
প্রথম হবো না।
এবং আমাদের জীবনও অসম্পূর্ণ বৃত্তাকার ঘুরে
কক্ষ-চ্যুত হবে।

হয়ত তুমি পারদর্শী কিছুটা
সেইজন্য কোথাও অলিম্পিকে
তুমি কখনো নামও দেবে।
কিন্তু তোমার নার্ভ কিছুটা ঢিলে হবে পরে।
এবং তুমি বাহামা ঘুরে পেন্‌সিলভেনিয়াব দিকে ছুটবে।
হয়ত আবার কোনো রেস হবে জেনে।

যদিও আমরা কেউই
স্থিতধি প্রাণটাকে রেখে ফিরি না।
আমরা জানি যে কোথায় অস্থিরতার প্রবাল দ্বীপ।
হয়ত উপত্যকার কিছু স্থানও
সর্বদাই অস্থির হয় ভূ-কম্পনের ভীতি-ভয়ে।

এবং তুমি জানবে
কোনো দৌড়ের শেষও নেই।
অথচ আমাদের জীবনও অসম্পূর্ণ বৃত্তাকার ঘুরে
কক্ষচ্যুত হবে।

সুতরাং ট্রাকের দৌড়ে
আমরা কোনোদিনো প্রথম হবো না।

আনুষ্ঠানিক

সমস্ত কিছুরই মধ্যে একটা
অনুষ্ঠান আছে। যে-কতক
মহিলা আর পুরুষেরা মিলে
পোষাক-আসাক সব না ছেড়েই
মাতাল হয়। অর্থাৎ চৌকো টেবিলে
কক্‌টেল মনোবিকার। হয়ত
কাছাকাছি ওয়েটারের মুচকি হাসির
পরিবর্ত্তে নিছক আড়ষ্ট চোখ-চাওয়া
সে-কেমন রতি সম্ভোগের মত—
ফাল্‌গুণী রাত এবং চাঁহুনি ধান-ক্ষেত
পেরিয়ে যাওয়ার স্মৃতি কথাও।
কিন্তু আমাদের পেছুটান
হতে দেয় না বেশীক্ষণ। কারণ
ভাবনার মধ্যেও মাতলামি অবশেষে
নিছক রূপ গ্রহণ করে। তখন
আবার ওয়েটারের কাজের মত
অনুষ্ঠানের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া।
দৃশ্য উপভোগে যেন,
কক্‌টেল পার্টিতে কতক মহিলা আর
পুরুষেরা মিলে পোষাক-আসাক সব
না ছেড়েই মাতাল হয়। ওয়েটারকে একটা
পাক্কা কাজের লোকও এই পর্যন্ত মনে হয়!

গণেশ সেন

[কবিতায় প্রচণ্ড চমক আছে। এক একটি বিশেষতঃ শরতের বৃষ্টির মত আচমকা বেশ বিস্ময় যোগায়। ষ্টাইলে খুবই আধুনিক। মিনমিনে কবিতা লেখেন না। কণ্ঠ খুব আন্তরিক, মনটা কিন্তু অন্তর্মুখী। এর কাব্যের উপকরণ আত্মসুখ, আত্ম-অনুভবের অভিব্যক্তি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই একান্ত নিঃসঙ্গ। কবিতার ফর্ম বা থীম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে। মাঝে মাঝে তা এক্সপেরিমেণ্ট করতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।]

কীট পতঙ্গ

শব্দের জন্য
প্রতিটি বৃক্ষের কাছে
লতাগুল্মের কাছে
অনায়াসে ভিক্ষে করা চলে।

রঙের জন্য
প্রতিটি পাখপাখালির কাছে
মাছেদের কাছে
যাচ্ঞা করা চলে।

আর ভালবাসার জন্য
চাওয়া যায় অনেক কিছুই
অনেক শব্দ,
অনেক রঙ,
অনেক মুখ ;
বিশেষ করে আমার মায়ের মুখ
যে আমাকে
একটু একটু করে ভালবাসতে শিখিয়েছিল
বৃক্ষ-লতা-গুল্মদের কীট-পতঙ্গদের।

উপহার

প্রতি বসন্তেই প্রিয়ারা
দীর্ঘায়ু কামনা ক'রে
উপহার পাঠিয়েছে।

চন্দনের বাক্সে গার্ডিনাল চকলেট।
হলুদ-খামে ক্যান্সারের ভাইরাস।
হাতিরদাঁতের মূর্তির মধ্যে সবুজ মাকড়সা
এসেন্সের শিশিতে তরল আর্সেনিক।
এবং মধুমিশ্রিত তেজস্ক্রিয় চূর্ণ।

আমি সহস্র বসন্ত
উপহারের লোভে বেঁচে থাকবো।

পরম প্রতারক

রজনীর চোখের ইশারায়
ঘি কাকড়ার লোভে
গর্তে হাত সেঁদিয়ে
আমি কেউটের ছোবল খেয়েছি।

হোটেলউলির আতিথেয়তায়
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে
গরম দুধে সাকো বিষ গিলে
খুইয়েছি সোনার তাবিজ, টিনের বাক্স।

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পেয়ে
মন্দির সংলগ্ন পুরোহিতের চালায়
নষ্ট মেয়েমানুষকে গন্ধর্ব বিয়ে করে
আমি স্মৃতি স্বরূপ রেখে এসেছি একটি কান।

এখন আমি জেনে গেছি
সর্বত্রই সাপের গর্ত।
সর্বত্রই প্রতারক।

আমি ঠাকুরদার ব্যবহৃত ক্ষুর নিয়ে চলাফেরা করি

স্বপ্নের মৃতদেহ

প্রতীক্ষার জন্য বৃক্ষ—
চিঠির জন্য পাখি,
ভালবাসার জন্য নারী ;
হাত বাড়িয়ে চাইতেই—
নদ-নদী হেসে কুটি কুটি ।
অরণ্য-পাহাড় ত্রিকালদর্শী ।

ইথারের বুকে আর্তনাদ ছুঁড়ে মারতেই
চাঁদ দিল গা ঢাকা ।
নক্ষত্র গেল ডুবে ।
বিনা মেঘে শিলাবৃষ্টি
বুকের অরণ্য পাহাড়ে ।

প্রতীক্ষার বৃক্ষ পায়ে পায়ে
বুড়ি ছোঁয়া প্রান্ত গেল পেরিয়ে ।
পিয়ন পাখিটা নিখোঁজ ।
ভালবাসার সব নারী
ইপ্সিত ঘরে পরপুরুষের প্রতীক্ষারত ।

এখন কার কাছে স্বপ্নগুলি ফেরৎ চাইতে পারি ?

সন্দেহ-ভয়-অবলুপ্তি

ভালবাসা চোখ না লেসার রশ্মি ?
ফলের হৃদপিণ্ড চিড়ে
আঙ্গুলে জড়িয়ে নিয়ে যায় নীল সূতো।

ত্রিভুজ পার্কের জলকুমারীর
নগ্ন উরুর সৌন্দর্য্যে
নিদারুণ ভয় পেয়ে আমি ম্যাজিকের তাস
সবুজ রুমালে চোখ বাঁধি।

হে শঙ্কর—হে এ্যামিবা সভ্যতা
আমি ক্রমাগত বধির হয়ে যাচ্ছি
পাথরে খড়গ ঘসার ঘাতক চিৎকারে।

অসময়ে দেবতার বরমুদ্রা যাজ্ঞা করে উৎকোচ
কিমাকার মানুষ বাজিয়ে চলেছে একটি রেকর্ড
শেষ থেকে শুরুতে যাব
নানা রঙের পশুর মুখোসের শোভাযাত্রা।

এ সময়ে ঘূর্ণমান চেয়ারে
পাতাল রেলের ব্লু-প্রিন্টে চোখ বিঁধে অবাঙমানসে
কতদূর করা যায় স্বপ্ন সফর ?

বিগত শতাব্দীর বাদামী ঠিকানা খুঁজে
ছয় অঙ্কের সাঙ্কেতিক নামে
তোমাকে কি ডাকা যায়
মুখোমুখী নক্ষত্রের ছাদে ?

নীল অন্ধকারে
ফোনের ডায়েল আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিঘর ভেবে
নিমেষেই ক্ষত করা যায় ফুলেদের বুক।
করোষ্ঠী রেখার অন্তর্গত
গ্রহ-সমুদ্র-জীবন
বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে দাউ দাউ
সন্দেহ-ভয়-অবলুপ্তির
তাৎক্ষণিক সংঘর্ষে।

যাদুকরী

অজস্র পাতার অন্ধকারে
তার কুচফল মুখ
আনাগোনা করে।

যে আমাকে
সংগোপনে
অন্ধকার ঘর জানালা গলিঘুঁজি
সিঁদেল চোরের মত চিনিয়েছিল।

আর শিখিয়েছিল
জাগতিক সব কিছু সম্মোহন করে
প্রতিটি সিন্দুক খুলে ফেলার আশ্চর্য্য যাদু

কবিতার ডিম ফুটে

- শবযাত্রায় কবিকুলের দাঙ্গা
- ফাগের পিত্তি খেয়ে নিক্সনের মূর্চ্ছা
- করবী গোটা গিলে বিদেশী ভালুকের মৃত্যু
- আন্তর্জাতিক কুকুর প্রদর্শনীতে উ থা

(সংবাদ)

০ কবিতার ডিম ফুটে উড়ে গেছে নিশাচর পাখি
৯ ধাতব জ্যোৎস্নার নীচে গলে যায় মৃত অজগর
৮ পালিত বৃক্ষের পায়ে বেজে যায় হাতির শিকল
৭ সময় পালিয়ে যায় চুরি করে ভাঁড়ারের চাবি
৬ ফুলের মধ্যে খিলখিলিয়ে ওঠে বাজে মেয়েমানুষ
৫ গন্ধের আড়ালে কাঁপে আত্মঘাতী ছায়া
৪ ক্রমাগত হিংস্রতর শুভ্রতায় বিঁধে যায় শিল্পের হৃদয়
৩ মুখের অন্ধকার থেকে লাফিয়ে পড়ে ডায়নাসোর পা
২ চোখের হলুদ শস্যক্ষেত্রে চড়ে বেড়ায় চিতা
১ আঙ্গুল লতিয়ে যায় পাহাড়ী গিরগিটি……

সম্পাদক
তোমার চেরা জিব এবং ভাঙ্গা হাঁটুর জন্য
অরণ্য ধর্ষণ করে আমি এনেছি
গণ্ডারের চর্বি—লাল পিপড়ের ডিম…

গৌতম মজুমদার

[গল্প-বলার ছলে কবিতা লেখেন। ঢঙটা একান্ত নিজস্ব। ষ্টাইলটাও। সেটা সচল কি অচল তা নিয়ে মাথা ঘামান না। দু'চোখ মেলে চেয়ে দেখা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কবিতার সহস্র উপাদান ছড়ানো রয়েছে। সেই উপাদানগুলোকে সযত্নে চয়ন করে একটি নিখুঁত মালা গাঁথাতেই এঁর আনন্দ। দৃষ্টি খুবই আন্তরিক। কবিত্বও নির্ঝরের নির্মলতায় পরিপূর্ণ। লক্ষ্যের বিষয়: তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের চাতুর্য, বর্ণনার অভিনবত্ব আর উপমা সৃষ্টির নিষ্ঠা ও শ্রম।]

কলম্বাস—বাতিল

কলম্বাসের ডিম ভাঙার গল্প এখন শুধু গল্প-ই।
কলুটোলায় তিনতলার মসৃণ দেওয়ালে
ডিমের কুসুম এবং খোসার মিলিত চেষ্টায়
আমি শেষবার দাঁড়ালাম, কলম্বাস—
তোমারই সম্মানে।

এর চেয়ে জাহাজের মাস্তুল অনেক বিশ্বাসী।
দাড়ির টান সেখানে সর্বত্র সমান এবং আন্তরিক।
ভিত্তি যেখানে সত্যিই ভিত্তিহীন অথচ
অবশ্য প্রয়োজনীয়
কলম্বাস, সেখানে তুমি নিজেই বাতিল ডিমের খোসা

কলম্বাস, আমি চিরকাল মাস্তুল হয়েই
বেঁচে থাকতে চাই।

ঘড়ির খবর

ব্যস্ত সমস্তের মতো সাময়িক উপস্থিতি
সময়ের। আমি চুপচাপ ঘড়ি ধরে চলি।
যেন এলোচুল কালোচুল মনভুল
সিঁথি বেয়ে বৈধব্য এগিয়ে যায় রমণীর
সধবা সিঁদুরে। পুরোনো বন্ধুরা খোঁজে
নতুন আস্তানা। মাঝে মাঝে বেচাকেনা
নতুন যুবার কাছে কৌশলে ঘড়িটা
নাচাই! তারপর দরদাম। গুনে গুনে
তারপর টাকাগুলো তুলি। সময়েরা
চলে যায় হস্তান্তরিত কোন গোরস্থান
কিম্বা শ্মশানে।

চুপচাপ আমি শুধু
জেনে নিই মাঝে মাঝে ভেতরের
ঘড়ির খবর।

এভাবেই

বালকেরা ফিরে যায় খেলাঘরে রাজার মতোন।
বাদামী শরীর বেয়ে সেই দেখে ঝরে যায়
আমাদের কিছুটা বয়স—প্রতিদানে তুলে নিই
কিছু কিছু ফেলে দেওয়া স্মৃতি।
এ মহা পৃথিবী
যেন অলৌকিক মায়াবী কাজলে ঢেকে দেয়
শরীরের যতকিছু গ্লানি—দিন যাপনের শেষে
যতকিছু রাত্রি জাগরণ—সবকিছু যদিও বা
জারজ সময় বলে মানি।
বাদাম পাহাড়
জুড়ে ক্রমশই জমে ওঠে স্বপ্নের মাদল।
বাৎসরিক ছুটি পেয়ে কেউ কেউ চলে আসে
স্বামী-পুত্র নিয়ে—অশুচি রাত্রির মতো
বেজে যায় বেহায়া রেডিও—যদিও বৈকালী হাটে
কেউ গায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত।
এভাবেই চলে আসে
বালকেরা খেলাঘরে অন্য কোন খেলাঘর থেকে।
পড়ে থাকে দিনমানে প্রাত্যহিক অভ্যস্ত জীবন—
ট্রামের চাকার সঙ্গে জীবনের অরূপ রতন সন্নিহিত
নয় জেনে সকলেই প্রসন্ন বদন!
জলকেটে এভাবেই
চলে আসে ক্যালেনডারে কিছু কিছু রাজকীয়
দিন। এভাবেই বালকেরা ফিরে আসে খেলাঘরে
সর্বত্যাগী রাজার মতোন।

অর্থহীন স্বীকারোক্তি

অক্ষম বালক ঘাড়গুঁজে ঘরে ফিরে আসে।
ঘাসে ঘাসে দোল খায় অগণিত মানুষের মুখ
শরণার্থী শিবির থেকে অতি দ্রুত নির্বাসিত
সুখ—অবশ্যই ফিরে যায় অনিবার্য রমনার মাঠে।

এ রকম খেলা চলে রাত্রিদিন জাহাজে মাস্তুলে
ঢেউ গুনে তুলে যায় রমণীয় জাতীয় পতাকা।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কপোতাক্ষ তীরে
মাইকেল-মঞ্জিল কিম্বা পুরোনো মিছিলে
আঁকা থাকে সার সার মানবিক কৌতূহল বোধ।
শোধ করে দিয়ে যাই আজন্মের জমানো বেদনা।

নিপুণা বেশ্যার মতো স্বাভাবিক সপ্রতিভতায়
এক হাতে ভিক্ষাপাত্র—অন্য হাতে মদের গেলাস
আন্তরিক দুঃখ নিয়ে অক্ষম বালক বাধ্য হয়ে
ফিরে আসে কৈশোরের স্মৃতিময় নীড়ে—
যদিও জানাই আছে সংবাদ-ভাষ্যের কাছে
এ সমস্ত অতি অর্থহীন।

নিষ্প্রয়োজনে

সুরম্য অট্টালিকা অকস্মাৎ ভূকম্পনে
ভূ-প্রোথিত হলে হৃদয়ের জানালা-কপাট
আচম্বিতে বন্ধ হয়ে যায়।

আমি চার দেওয়ালের বাইরের ফকির
মন্ত্রপূত কমণ্ডুল নিয়ে ইতঃস্তত ভ্রমণ-চঞ্চল
কবরের মাটির ওপর
একমুঠো ভালোবাসা ছড়িয়ে বীজ বুনি।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়।

স্বপ্নে ফোটে ঘাসফুল—অভ্রান্ত নিয়মে।
আমি—হৃদয়ের বন্ধ জানালা-কপাট,
স্মৃতির প্রকোষ্ঠ, দেওয়াল ঘড়ির চাবি
সব কিছু ঝকঝকে পরিষ্কার রাখি।
কবরের অন্তিম প্রয়োজনে নিজস্ব নিয়মে
কিছু কিছু ঘাস-ফুল চেয়ে-চিন্তে রাখি।

অতঃপর ঘাস-ফুল সম্পর্কিত মেলায়
দর্শক-প্রতিম আমার ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত ভূমিকা প্রসঙ্গে

সমস্ত চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অব্যক্ত সুখের প্রবাহ
আকাশ, মাটি, ফুল—মনে মনে গতিপথ খুঁজি।
দূরাগত জাহাজের অস্ফুট আমন্ত্রণে আমার
গাংচিল ডানা মেলে উড়ে চলে যায়।
অথচ, দৃশ্যপটের এই রঙ তামাশায়
আমার বিকল্প কোন ভূমিকা নির্দ্ধারিত হয়নি।
আসন্ন শেষ বিচারের দ্রুত প্রস্তুতির সমারোহ

মাটী, আকাশ ও সামুদ্রিক জলযানের সর্ব্বত্র।
অতএব, সন্ধানী নাবিক, লক্ষ্য স্থির রেখো
বন্দরের ঘাটে ঘাটে সমবেত জনতার
মানচিত্রে অগণিত শ্যামলীর মুখের আদল
তোমাকেই ঠিক ঠিক এঁকে দিতে হবে।

প্রয়োজনে—অনিচ্ছায়

ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র ভেঙে চুরে চুরমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারি
কিন্তু সেতো সহজ ব্যাপার !
আপাততঃ প্রয়োজন সময়ে সময় রেখে শরীর মাপার
জলপাত্র দূরে রেখে অনায়াসে স্নাত হতে পারি।
প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে কচি কলাপাতা,
শিরীষ গাছের ছায়া, ম্লান চন্দ্রালোক
সব কিছু ছেড়ে দিয়ে—পার হ'য়ে ভূলোক দ্যুলোক
অনায়াসে চলে যেতে পারি, পৃথিবী আমার কাছে সর্ব্বদাই ঋতা।

ঋতুমতী যুবতীরা একে একে পার হয়ে গেলে
সম্ভোগের বাতিঘর বেবাক নিভিয়ে—
নিঃশব্দ শীতরাতে ভিজে হাতে জানালাটা খুলে
আশ্চর্য আবেগ নিয়ে কথা বলি চিবিয়ে চিবিয়ে !
আজকাল, প্রয়োজনে সবকিছু এইভাবে সয়ে নিতে পারি।
বেদনায় ইদানীং সামান্য সময়
নিতান্তই অনিচ্ছায় ব্যয় করে নারী।

ধ্রুব মুখোপাধ্যায়

[কৈশোরকাল থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ। প্রমাণ আছে অধুনালুপ্ত হাওড়ার কয়েকটি সাহিত্য সংস্থার ইতিহাসে। সৃষ্টিকর্মে অক্লান্ত। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সব কিছুই সমান দক্ষতায় লিখতে পারেন। অনুবাদেও বেশ বলিষ্ঠ হাত। নামী-অনামী বহু পত্রিকায় অনেক দিন ধরে লিখছেন। কবিতা ছেড়ে ইদানিং প্রবন্ধ রচনায় ঝুঁকেছেন বেশি। মধুর সংবেদনশীল কবিতার ধারা অব্যাহত রেখেছেন দীর্ঘদিন। দুরূহ শব্দজাল বা কষ্টকল্পিত রূপকল্পের মঞ্চ থেকে এঁর লেখা কিছুটা দূরে। শিল্পবোধ পরিষ্কার। ভাষাও স্পষ্ট এবং ঋজু। আর জনান্তিকে বলা যায়, সমকালীন পৃথিবী—ছোট করে বলতে গেলে এই জন্মভূমি যেখানে 'জ্যোতিহীন চতুর্দিকে অজস্র রক্তের প্লাবন', সেখানেই কবি পান—'বন্ধ্যা জীবন থেকে নতুনতর মুক্তির' শপথ—এটাই হয়ত ধ্রুববাবুর কবিতার প্রেরণা।]

উপলব্ধি

দুর্দৈব আমার রাত সংঘবদ্ধ যৌতুকে হারি
অপাপবিদ্ধ নিয়তি স্মরণের ফেনা বয়ে যায় ;
শূণ্যগর্ভ শমীবৃক্ষ যদি বীজ বোনে আলোকেরি
তবে কি অলভ্য তুমি মহামৌন শান্তশূন্যতায় !
প্রদক্ষিণ বৃথা জানি, আজীবন তোমার দাক্ষিণ্যে
বৃথা শুধু বাক্যব্যয় ; শিক্ষা দাও জীবনদর্শন ;
যে শোনে শুনুক তাহা, সবই তো মগ্ন নিশ্চৈতন্যে,
অতএব প্রজ্ঞাবান আর কেন অনন্ত জীবন !
প্রতিমার আয়োজন মহাকালে লীন যদি—
তখনও নিশীথ নিয়ে একান্ত নায়ক আমি
প্রজ্ঞাশূন্য হয়ে জাগি : অন্ধকার নিরবধি—
শূন্যে শূন্যে ক্ষয় হয়ে নীলিমাতে যায় থামি।
অতএব অনুত্তীর্ণ চির দয়িত জীবন
শূন্যগর্ভ আস্ফালন ব্যর্থ সিদ্ধির সাধন।

'৭১ এর জন্মভূমিতে

করপুটে অমল জ্যোৎস্না ভরে আমি একা বসে জাগি
প্রান্তরে প্রান্তরে মরসুমী ফুল,
এস্রাজের ছড়টানা নারীর কোমল গ্রীবা ;
অথবা অন্য কোনো দূরতর নক্ষত্রের গান
শিশুর কোমল অশ্রুর মত টপ টপ ঝরে।
শীতের কুয়াশা নামে—মুক্তি দাও! মুক্তি দাও।
প্রার্থনার গায়ত্রী মন্ত্র আকাশ কাঁপায়।
শঙ্খধবল হাত তুলে সে আমাকে ডাক দিল
তৃণসমারোহ প্রান্তরে
প্রদোষের ছায়াচ্ছন্ন আলিঙ্গণে,
তারই স্মৃতিতে জেগে আছি জ্যোৎস্নানিলীন হয়ে।
তরলিত স্বর্ণসূর্য ভোরের আশিস হোক।
অঙ্কুরিত হোক বৃক্ষশাখা,
ফুলের বুকেতে কাঁপুক নারীর নম্র বচন ?
প্রান্তরে ঘাসের আঁচলে থাকুক খাঁচার দাক্ষিণ্য।
যেহেতু পৃথিবী এখন স্তব্ধ ;
মৃত করুণ ভারবাহী শবের মতন।
হাড়-মজ্জা-মেদ-অস্থি,
মানুষের প্রেয়সীর অন্তিম করুণ রং ;
কাঁকন হীন হাত কাঁপছে
যেন নতজানু বৃক্ষের প্রার্থনা।
নবজাতকের মুখে ফোটে বিষাক্ত স্বপ্নের ঘোর,
কর্দমাক্ত রাজপথে পিচ্ছিল সরীসৃপের ক্লেদাক্ততা ;
জ্যোতিহীন চতুর্দিকে অজস্র রক্তের প্লাবন ;
নিঃশেষিত মধ্যরাত্র ; অন্ধকার ভ্রুকুটি ভয়াল,
যুবতীর স্নায়ুতে বিচ্ছিন্ন প্রলাপ

বিদ্রূপ করছে আমার সৃষ্টিকে।
কী ভীষণ অন্ধকার! রক্তের কল্লোল!
অদীর্ঘ আয়ুর বুকে তরাঙ্গিত নীল মৃত্যু :
ছিন্নভিন্ন মাধুরিমা—অর্ধদগ্ধ শিশুদেহ—
উন্মত্ত করুণ সুর প্রমত্ত নর্তন :
অজস্র করোটি-কংকাল—উৎরাই-চড়াই :
নদীস্রোত রুদ্ধগতি;
আলোকগঙ্গা প্রতিহত,
নবজাতকের অলব্ধ কান্নার সুর
বিদ্রূপ করে 'সোহহং' এর মন্ত্রকে :
'আত্মানং সিদ্ধি' কামুকের পদতলে পিষ্ট হয়ে
যুবতীর অজস্র ইচ্ছার শবাধারে ফুল হয়ে ফোটে।
চতুর্দিকে নরকের সশস্ত্র প্রহরী;
উদ্ভিন্ন পশারীর দেহে লবনাম্বু সমুদ্রের স্বাদ।
বিবসনা ধরিত্রীর বুকে অজস্র কীটের সঞ্চার—
অন্তিম সূর্যের আলোয় প্রতিভাত শবের পাহাড়।
হয়তো ফিরবে না আর পরিচিত দেবদূত;
শেষ গোধূলিকে চুমো খেয়ে
নরম ঘাসের বুকে পা রেখে
সে চলে গ্যাছে।
দিনান্তের সূর্য আর হয়তো
ঋতুর গভীরে সঞ্চারিত করবে না অগ্নিকণা।
শুধুমাত্র অন্ধকার কী ভীষণ নির্মম পিচ্ছিল!
হত্যাকারী ক্রুর চোখ, শব্দহীন উপপ্লব,
পত্রহীন তরুলতা, ফুলদল নির্বাসিত—
অজস্র কাঁটার বুকে অন্তিম যন্ত্রণা।
তারি মাঝে একা জাগি
প্রত্যাশার স্বপ্ন রেখে চোখের তারায়।

যদি কোনোদিন ডাক দাও
শঙ্খধবল গ্রীবা তুলে
আমাদের পরিচিত জনারণ্যে—
এ বন্ধ্যা জীবন থেকে নতুনতর মুক্তির শপথে
অথবা—
ভীষণ আঁধার নিরক্ষরেখার
জ্বলন্ত সূর্য ছিনিয়ে নিতে ॥

হো-চি-মিন

বিপ্লব আরক্ত প্রাচী : যজ্ঞ অশ্ব করতলে জনতার ;
সংশয় সন্দেহ শেষ, স্বপ্নস্তম্ভ অমলিন অমরার
কালের রাখাল হাতে। প্রত্যুষার আলোছায়া আজ
তুপুরের রক্তিম সূর্য ; উদ্ভাসিত অন্যতর সাজ।
ক্রেমলিন নক্ষত্র ছিল ; অচপল ভল্‌গার গান,
মেকং মেঘনা পদ্মা একাকার হোয়াংহোর তান।
বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে জেগে থাকো হ্যানয় আকাশ
মুক্তির আশ্চর্য গন্ধে ভরপুর বারুদ বাতাস।
নতুন বিপ্লব আজ, মুক্তির ঋত্বিক নবীন
অমর প্রাণের স্পর্শে তুমিই কমরেড হো-চি-মিন !

প্রার্থনা

অলিন্দ থেকে সরে যাও—বৃত্ত হবে সমস্ত পৃথিবী।
রবীন্দ্রনাথের অনেক গান—দেওয়ালেতে ছবি হয়;
বোঝে শুধু চিত্রকর মানবক। আকাশ পুষ্পিত হোক;
কমলা আর সবুজের সমাবেশে আবৃত্ত সমগ্র পৃথিবী
অন্ধকার গর্ভ থেকে আলোকের দ্বীপ—
শান্তির বরফ হয়ে জেগে ওঠা কুঁড়ির মতন,
অযুত সূর্যমত্ত পৃথিবী আমার
ভালবাসা দ্রাঘিমা হয়ে মুছে দাও যন্ত্রণার অক্ষরেখা॥

সেক্সপীয়র : ১৯৬৪

এখনো তোমার নাম নিবিড় আধারে
নক্ষত্রের দ্যুতি দেয়; কৃতঘ্ন মানুষ
অন্ধকার দূর দ্বীপে প্রলয়ের দ্বারে
ছুটে চলে ছিন্নমস্তা বিষন্ন বেহুঁষ।
অন্ধকারে অতি দৈব, দুর্দৈব প্রণয়;
তবুও তোমার প্রজ্ঞা মর্ত্ত্য মৃত্তিকায়।
সমস্ত আকাশ জোড়া ভয়াল কান্নায়
ভেঙে পড়ে সব গীর্জা স্পন্দিত দোলায়।

উপস্থিত সন্ধিলগ্নে নির্বাসিত দূরে—
নাটকের কুশীলব আরোপিত দেহে
অতীতের স্বর্ণশস্য গল্প শুনে ফেরে,
প্রেমিকার নিরালম্ব আয়ত্রিকা গৃহে।

আমি তাই মুঞ্জরিত—তুমি জাগরুক
অভিন্ন হৃদয় নিয়ে যা ঘটে ঘটুক॥

বিস্মৃতি

মানুষ আজ কি ভুলেছে তার ?
তার এত দুঃখ বেদনা বা নৈরাশ্যের জ্বালা কেন ?
লালবল লোফালুফি করা
ছোট ছোট শিশুদের কচি কচি হাতগুলো,
ফড়িং রঙা ঘাসফুল,
দীর্ঘাঙ্গী বটের দল,
কিশোরীর পবিত্র কোমলতা,
প্রিয়ার আনত নয়ন,
সোনালী আলোর পাড় মোড়া
শরতের সকাল ; অথবা—
প্রিয়তম প্রবাসীর চিঠি,
কি আজ হারালো সে ?

রাজপথে লালরক্ত ভাসে ।
অত্যাচার তীব্রতর
তবুও মরণপণ,
টগবগে দুরন্ত যৌবন
ছিন্নভিন্ন ধোঁয়াটে গোধূলিতে ।

সূর্যদূতী উষা আজ প্রতিহত এ গোলার্ধে ।
গাঢ়তম অন্ধকারে আকাশ কালচে-নীল ।
অপুষ্পক প্রান্তরে শুধু রক্তাক্ত সবুজ ঘাস ॥

কালের রাখাল সে কি বাজায় নি বাঁশী তার ?
ডাকে নি কি আমাদের ?
তবে কি মানুষ আজ নিজেকে ভুলেছে ?
শোনে নি লাবণ্যগ্রীবা নীলকণ্ঠধ্বনি,
নির্জন ঝর্ণার আনন্দ,

উপত্যকা—নদীপথ—শব্দিত জলধারা ;
ভুলেছে কি সনাক্ত অতীত অথবা
প্রোজ্জ্বল বসন্ত !

এ সব অদ্ভুত কথা
এ কালের শাব্দিক সভ্যতায় ;
নির্বাসিত অভিধানে—
প্রেম—ভালবাসা—স্নেহ-দয়া-মায়া ;
অতিক্রান্ত শৈশব, উত্তীর্ণ—
হিল্লোলিত বনছায়া, নির্জন সৈকত ;

স্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দ সীমানায়
কালপুরুষের ঈশারা ভাসে
বাস্তুভিটের দিগন্তে।
সূর্য পরিক্রমা ব্যর্থ করার চক্রান্ত জাগে
আবার বিন্ধ্য পর্বত মাথা তোলে ;
নির্বাসিত অগস্ত্য জেনো ফিরবে না আর।
বজ্রের প্রচণ্ড আলোকে
মহানিম ঝলসে যায় ; তবুও,
পুলহ, পুলস্ত্য ভিক্ষাভাণ্ড হাতে
মানুষেরই দ্বারে দ্বারে
ডাক দিয়ে ঘোরে ;
অচপল দ্যুতিতে ভাসে
পরিচিত মাঠ ঘাট, জাঙালের ফাঁক,
নদী-নালা—খাল-বিল—গোরুর বাথান,
হৃষ্টপুষ্ট শিশুদল,
মানুষের প্রথম প্রেম
কোনও এক মানুষীর সাথে।

বরুণ ঘোষ

[ছোটগল্প লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-চর্চা শুরু। একদা একটি প্রসিদ্ধ কিশোর পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। অভ্যুদয় ঘোষ ছদ্মনামে। আজ সে চর্চা প্রায় ভুলতে বসেছেন। কবিতার চর্চা তার অনেক পরে। কিন্তু অসম্ভব কম লেখেন। যেটুকু লেখেন বন্ধুবান্ধবদের চাপে। লেখার অতি-স্বল্পতার কারণ কী—বিষয়ের অভাব না ইচ্ছার অভাব? লেখকের মতে দুটোই। সমসাময়িক পৃথিবী এবং বিশেষ করে বাড়ির চারপাশে প্রতিদিনের ঘটনা নিয়ে কিছু লিখতে সব সময় ভালোবাসেন। কবিতায় উদ্ভট বা দুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে অপছন্দ বেশি; তার পরিবর্তে পছন্দ কবিতায় সূক্ষ্ম স্টোরি-এলিমেন্ট অনুপ্রবেশের।]

রূপান্তর

কত দিন আলোগুলো জ্বলল না,
কত দিন অন্ধকার বুকে করে
আকাশের তারাগুলো একে একে গুণে যাই ;
কতকাল বিদেশীর মত প'ড়ে আছি
নির্জন সৈকতে……নিঃসঙ্গ কতকাল !

আবাল্যের পরিচিত পথগুলো
ক্রমশঃ কেমন ঘোরালো হ'য়ে
শূন্যতায় প্রহর গুণছে প্রতি দিন ;

অথচ—এই তো সেদিনও
ওইখানে ছিল আমার কিশোর-আকাশ,
থোকা থোকা জ্যোৎস্নার ফুল আর
স্বপ্নের নেশা.... ....

এ আমি কোথায় চলেছি দিনে দিনে........
আমার স্বপ্নের পথগুলো
ভালোবাসার সব রঙ মুছে ফেলে
এঁকে গ্যাছে সারা দেহে রক্তের ছাপ ;

কতদিন আলোগুলো জ্বলল না,

আর কতকাল
আবাল্যের পরিচিত পথগুলো
উদাসীন বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে
তার দেহে শত শত পিকাসোর ছবি ?

বর্তমান

অনেক দিন টেবিলে কবিতা নিয়ে
পাঠ হয়নি রবীন্দ্রনাথ,

এখন বুক কেসে সব কবিরা ঘুমুচ্ছে,
কথা শিল্পীরা সাপ্তাহিক রাশি ফলে
জীবন মেলাতে ব্যস্ত ;

পাশের বাড়ীতে রেডিয়োটা চলছে,
একটা বাদ্যযন্ত্রে গানের সুর ভাসছে ;
ঘরে কেউ নেই ;

বড় ইচ্ছে করছে
কুসুমকলির মত এই সকালে—
একটা কবিতা পড়ি —
রবীন্দ্রনাথ অথবা এলিয়ট,

কিংবা কান পেতে শুনি—
পাশের বাড়ীর রেডিয়ো—
বাদ্যযন্ত্রে সংগীতের সুর,

মনটা উৎসুক হয়ে আছে ; এখনি
এলো ভোরের কাগজ— হেডলাইন—
কারাগারে গুলিতে আটজন বন্দী নিহত.... ...

মহীরুহের পতন ঘটল,
নাড়ীর সুতোয় টান ধরল তীব্র বেগে
একে একে সব গ্রন্থি ছিন্ন হোল ;—
রবীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, রেডিয়োর যন্ত্র সংগীত
বন্ বন্ ঘুরছে ।

তবুও কে যেন বলছে বহুদিন
তুমি কবিতা পড়োনি, বরুণ ।

চেতনার ঢেউগুলো ফিরে এলে

চেতনার ঢেউগুলো ফিরে এলে
আমি সব আর্ট গ্যালারিতে
একই ছবির প্রদর্শনী দেখি

চেতনার ঢেউগুলো ফিরে এলে
সব শিল্পীরা একাকার হয়ে যায়
চেয়ে দেখি—
একই মন
একই ভাবনা-চিন্তাগুলো
সকলের অন্তর্গত হয়ে কাজ করে
জীবনের লক্ষ্য এক হয়ে সকলের সাথে মিশে যায়

চেতনার ঢেউগুলো ফিরে এলে
চেয়ে দেখি সব শিল্পীরা চাপায় একই রঙ
ক্যানভাসে ক্যানভাসে

দেখে যাই দৃশ্যপট—
মানুষের একই রূপ
ইতিহাসে প্রতিবার ঘুরে ফিরে আসে

অন্তরের নিভৃত কোণ থেকে তোমাকে, সোমেন

সোমেন, তুমি কবিতা লিখলে
আমি ভীষণ খুশী হবো,
কবিতার দর্পণে তোমার সনাতন ছবি
কতদিন দেখেছি আমি ;
শুনেছি এখন তুমি কবিতা ছেড়ে
এক তরুণ খেলায় মেতে গ্যাছ ;
কী পাও সেখানে তুমি ? কী উল্লাস আছে ?
এ বড় নিষ্ঠুব খেলা
গুরুতর পরিণতির আশঙ্কা সদা !
সোমেন, এখনো সময় আছে
ফিবে এসো কেয়াপাতার নৌকো চড়ে
পরিচিত মহলে ; কী তুমি খুঁজছ, ভাই—
কোন এক স্বতন্ত্র আকাশ ? একই আকাশ সবখানে—
যা দেখেছ শিশুকালে মায়েব কোলে,
এখন মায়ের কোল থেকে নেমে গিয়ে
দূরে চলে গেলে পাবে সেই—
একই আকাশ, একই চন্দ্র-সূর্য-তারা !
কী হবে ফেলে দিয়ে পুবাতন আসবাব গুলো ?
প্রাকৃতিক নিয়মে সব কিছু
একদিন আপনি বিলীন হবে।
তবে তুমি কেন অপরাধী হবে—
পরিচিত মহলের চোখে, রাজার বিধানে ?
সোমেন, তার চেয়ে তোমার বিশিষ্টতা নিয়ে বেচে থাকো-
একটা কবিতা লেখো সারাটা জীবন দিয়ে।

ক্ষুধিত যৌবন নিয়ে

ক্ষুধিত যৌবন নিয়ে
তুমি আর
কোন বারোয়ারি পূজোয় মেতো না, শোভন,

তাতে শ্রম যত্ন বাড়ে
খিদে তত মেটে না ;
কেননা
পূজো-টুজো কেটে গেলে
ঠাকুরতলায় তুমি একা
খিদেটাও ক্রমশঃ ঘনীভূত
শিকারের নেশায়

অথচ কোথাও কেউ নেই—
যে দেবে তোমার মুখে
একমুঠো ভোগের প্রসাদ।

একখানি চিরকুটের প্রত্যাশায়

শুনেছিলাম একদিন সাম্রাজ্যের রঙ হবে ধান শিষের মত হলুদ
গোলাভরা ধান নিয়ে রাখাল-বৌয়ের হাসি সোনা হবে—
শুনেছিলাম এই কথা একদিন—বহুদিন—চিরদিন
অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন সাম্রাজ্যের রঙ বদলের

অপেক্ষা আর নয় ;
এখন প্রতীক্ষা শুধু একখানা চিরকুটের— মৃত্যুর পরোয়ানা

রাজা তোমাকে বলছি, শোন ঃ
আমি তো কোনদিন যাইনি তোমার প্রাসাদ দ্বারে
কোনদিন দেখিনি তোমার রাজ-সাজ—
জানি না তোমার পালঙ্কে কত গদী আছে
জানি না তোমার রাজদণ্ড কোথায় থাকে
অথবা বিচারের নামে প্রহসন করো কিনা

রাজা তোমাকে বলছি, শোন ঃ চিরদিন মেনে গেছি
চিরকাল মেনে যাব তোমাকে, তোমার উত্তরাধিকারীকে
অথবা অন্য কাউকে—যে হবে আমার প্রভু

অথচ এই অঙ্গীকার নিয়ে
তোমার দে'য়া মৃত্যুর নোটিশে
চলে গেল এই গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে
অমল-বিমল-কমল প্রভৃতি সাধারণ মানুষের দল
তাই, কিছু প্রত্যাশা নয় আর
আমার প্রতীক্ষা এখন একখানি চিরকুটের—
মৃত্যুর পরোয়ানা।

প্রতিমা বিসর্জনের পর

প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে শেষ রাতে | অন্তিম যাত্রাও ভেঙ্গে গেছে
বাত্তিরা ঘরমুখী | নিঃসঙ্গ পূজা মঞ্চে প্রদীপের আলো | ক্ষীণ হয়ে আসে
এখনো একা বসে কী করছে মহাকাল ?

চালচিত্র কী ডুবে গেছে ?
হয়ত বা | যায়নি এখনো ডুবে | এ জন্মের চালচিত্র
দেবতার ছবিগুলো আবছা হলেও | সেখানে হাজার ছবি | অগণিত
মানুষের | এখনো স্পষ্ট যেন

প্রতিমা ডুবে গেলে | চালচিত্রের হাজার ছবি | একে একে ভেসে ওঠে
জলের ওপর—
ওই ছাখো বাংলাদেশ | ওই ছাখো খুনী কলকাতা | ওই ছাখো দ্বিতীয়
হাওড়া ব্রীজের পরিকল্পনা | সব ছবি | একে একে ভেসে যায়

ছবি কি এখানেই শেষ ?
এখনো অনেক বাকি | এগিয়ে-পিছিয়ে খেলা | অনেক নতুন
শুরু | অথবা | শেষ থেকে শুরু
আসলে অনেক ছবি—
প্রিয়তম স্মৃতি | বিশ্বাসহননের ব্যথা | সম্রাটের মূঢ়তা—
ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে যায় | সূর্য পতনের দিনে

প্রতিমা ডুবে গেলে
চালচিত্রে | মানুষের ইতিহাস | বঙ্কিম হয়ে ভেসে ওঠে চতুর্দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

[বিজ্ঞানের লোক। তবু সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতা কম নয়। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চা নিয়ে মেতে আছেন। তবে লেখার চেয়ে পড়ার কাজটাই বেশি হয়। অধুনা সাহিত্যিক বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে লেখালিখি করতে হচ্ছে। কবিতায় সাংকেতিক ও প্রতীকের আশ্রয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। বাচন-ভঙ্গিও আধুনিক। ব্যঞ্জনায় হৃদয় সংবেদ্য। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা করতে চান। লেখায় নিজস্বতা : প্রয়োজন বোধে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার—যা তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের সুন্দর কাজ করে। তবুও একথা ঠিক—সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে নিজের লেখার চেয়ে অপরের লেখা পাঠে ইনি বেশি আনন্দ পান।]

মুক্তো ঝরে সূর্যের

এপারের চন্দ্রিমা চোখ বুজলে
রক্ত ঝরে সূর্যের
অন্ধকার গিরিখাতে বেজে ওঠে
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা
এলবুর্জে ছুটে আসে কালপুরুষ
নিউক্লীয়াসের গড়ন পাল্‌টায়
শ্রবণ-দর্শন-সব।

ওপারের চন্দ্রিমা চোখ বুজলে
অশ্রু ঝরে একোনাইটের
নির্মম ফুজিয়ামা ফেটে পড়ে
সুয়েজ আর সায়গনে
ছুটে আসে হিংস্র পশুর দল
রক্তের আশ্বাসে
বিষবাষ্প ঝরে পড়ে ড্রাগনের নিঃশ্বাসে
মেগাটনে অন্ধকার চতুর্দিক।

এপারের চন্দ্রিমা চোখ মেললে
মুক্তো ঝরে সূর্যের
উন্মত্ত বিসুবিয়াস শান্ত হয়—
ক্রুসেড সমাপন
ভেসে ওঠে শ্বেত কবুতর
শান্ত নভনীলে।

খাণ্ডবদাহন—শান্তিবনে

বুড়োটা এখনও জপ করছে !
মনটা হারিয়ে যাচ্ছে
খোয়াই-এর প্রান্তে—
কাঁসাই-এর গহণে—।

অথচ আম্রকুঞ্জে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়েছে।
অগ্নির আগ্রাসী ক্ষুধায়
আহুতি হচ্ছে শান্তিবন।
এখনও বুড়োটা জপ করছে !

বুড়োটা জপ করছে এখনও।
পদ্মার বোটে ভেসে বেড়াচ্ছে কবিতা।
বিসর্জনের ঢাক বেজে উঠেছে
শিলাইদহের আশেপাশে।
লুব্ধকের লোলুপ রিরংসায়
ধর্ষিত হচ্ছে ওপারের কলাবউ।
অথচ বুড়োটা এখনও জপ করছে !

আর তখন এদিকে—
রাজপথের সাদা পেভমেণ্টগুলো
অকারণ রক্তে হচ্ছে নিষিক্ত
উড়ন্ত পরীর ডানার নীচে
চলছে প্রেম প্রেম খেলা
দেবদূতেরা মত্ত হয়েছে
এক প্রচণ্ড প্রহসনে।

অথচ ওদিকে শান্তিবনে খাণ্ডবদাহন হচ্ছে।

আমরা সকলেই এক একটা স্পন্দন

আমরা সকলেই এক একটা স্পন্দন,
কেননা একটা স্পন্দন মানেই একটা জীবন
তারই মাঝে—
গতকালের আমি আর আগামীর তুমি।
আমার প্রণয়ী—ইতিহাস,
আর তোমার—ভাবীকাল।
অন্ধকারের গর্ভে আমি
তোমার আলোর প্রত্যাশার
সাথে মিল খুঁজি ;
অথচ তুমি জান—
আমরা কেউই আর
ইতিহাসের পাতায় ফিরে যাব না,
কেননা আমরা প্রত্যেকেই পিতৃত্ব চাই।
কাজেই এস—
পরিবর্তনের মুখে লাথি মেরে
তুমি, আমি, লাফ দিই
আলো অন্ধকারে।

ইতিহাস

তুমি, আমি—
যেন এক অজানা দুঃস্বপ্ন।
আচ্ছন্ন অস্থির রাত্রি—
এক দীর্ঘ আলোছায়ায়।

মানবতার ইতিহাস—
এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন.
আণবিক অস্ত্রের সম্মুখে।
লোমশ ভ্রূ-সহ এক জীব
খড়কুটো আগুনের আশ্বাসে—
বুকে আঁকড়ানো শিশু-নারী
ছোট্ট আগুনের সম্মুখে।

তারপর—
পাথরের অস্ত্র আর শাণিত তরবারি
পরস্পরের মুখোমুখি—
ধ্বংস শক্তি সঞ্চয়িত ক্রমে
মুক্তবেণী আর পরুষ সঙ্গীতে।

তিন লক্ষ কোটি বছর পরে
নগণ্য এক প্রাণী
সূচনা করল বিস্ফোরণের—
রামধনু সেতুর বর্ণচ্ছটা
মস্তিষ্কে তার,
পৃথিবী—ব্রহ্মালোকে।

সম্রাট হতে গেলে

সল্ট অ্যানালিসিসটা মনে আছে এখনও—
প্রথমে একটু অ্যাসিড
পরে আর একটু, ব্যাস—
চিচিং ফাঁক।

তোমার সাথে আলাপ হল
ভিক্টোরিয়া ল্যাবরেটরী
প্রথমে মিষ্টি হাসি
পরে আর একটু, ব্যাস—
তুমি আমার।
পিতার সাথে মুখোমুখি
ল্যাবরেটরীর রবট আমি
হাত ভর্তি কড়ি
পরে আবার কিছু, ব্যাস—
স্টেজ তোমার।

ঈশ্বর নেমে এলেন যখন
ল্যাবরেটরীতে আমি
প্রথম দফায় ছুরি
পরে আর একবার, ব্যাস—
চিচিং ফাঁক।

সম্রাট হয়ে গেলাম আমি।

কথা ছিল

আমাদের আকাশ যখন নীল হল,
সামুদ্রিক গোধূলি তখন গেরুয়া হয়ে
ছেপে দিল হলুদ রঙ। লালচে ডানাওলা
মাছগুলো জালের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে
ঝাঁপ দিল রজত নদীতে।
অথচ মণিকা বলেছিল—
আমাদের স্বপ্নের রঙ নীল হবে।

তোমরা যখন হলুদ জামায় সাজতে ব্যস্ত,
বিরাট সেতুটা তখন মাথার লাল মণিটা
আরও ওপরে তোলে,
ডবল ডেকারের চাকাগুলো আরও বড় হয়ে
কফি হাউসের সবার গায়ে
গেভা কালারের ইম্প্রেশান সৃষ্টি করে।
অথচ কথা ছিল সকলেরই লাল টুপী পরার।

তোমরা যখন আকাশের রঙ লাল কর,
শয়তানের সাপ তখনও কাণে ফিসফিস করে
তোমাদের উদ্দেশ্যে
বিষভরা পিপে তখন সমুদ্র পথে
তোমরা বসে আছ সবুজ আসনে
মহামারীর মহাশ্মশানে।
অথচ কথা ছিল শ্বেত সিংহাসনে বসার।

মহানির্বাণের অপেক্ষায়—

বসে আছি
মহানির্বাণেরই অপেক্ষায়।
আহত হৃদয়ের কোটরে
রক্তাক্ত সেলাম নিয়ে
বসে আছি—।
বসেই আছি—
নেই কি পরম বন্ধুদের কেউ ?

বাসে-ট্রামে-মোটরে
পথ চলতি মানুষের ভিড়ে
ফুটপাথে-লেকে
অপেক্ষা করেই আছি—
কবে হবে মহানির্বাণ ?

ওপারের লোকগুলো
আর কিন্তু অপেক্ষা করে নেই।
ওরা সকলেই একা একা
অথবা একসাথেই
এসে দাঁড়িয়েছে নদীর পারে
ঝাঁপ দিতে—
মার অথবা মারী
কেউই আর বাধা দিতে পারছে না
ওদের এই তপস্যায়।
অথচ
আমরা অপেক্ষা করেই আছি
সেই বন্ধুদের অপেক্ষায়—
সারা জীবনই কিনা কে জানে ?

শঙ্কর মজুমদার

[শঙ্কর মজুমদার—কবি ও শিল্পী। তার কাছে তাঁর আঁকা ছবির ভাষা আর লেখার ভাষা এক। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন তিনি। তাই সে ভাষা এত ছন্দোময়। এত নিটোল জীবন্ত। তবে কী ছবিতে, কী লেখায় 'অরিজিন্যাল' কিছু কাজ বা বক্তব্য রাখতে ভালো বাসেন! আর ছবির চেয়ে হয়ত কবিতায় তা আরো দ্রুত বলতে পারেন বলে তিনি মনে করেন। কবিতা লিখছেন অনেকদিন। এম, এ, পড়ার সময় একটি বইও লিখেছিলেন। নিজের কবিতা প্রকাশ সম্পর্কে তাঁর মত: "বাইরের দুনিয়ায় যা চলমান তার মধ্যে cruelty যতই থাকুক, কিছু কিছু মজাও আছে। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ওই সব মজা বা আমোদগুলোকে গেঁথে ফেললে বেশ আরাম পাওয়া যায়।" ইংরাজী প্রবন্ধ রচনায়ও ভালো হাত আছে। বিশেষতঃ চলচ্চিত্র-শিল্প প্রসঙ্গে।]

॥ ১ ॥

সব বিবেচনাগুলো
জেব্রা ক্রসিং হয়ে পথে পথে পড়ে থাকে
অথচ বন্ধুরা
আজ অব্দি কেউ বলল না
চলতে শেখো শঙ্কর।

আমি
অবুঝের মত যেখান সেখান দিয়ে
এতগুলো রাস্তা
পেরিয়ে এলুম।

॥ ২ ॥

বাড়ীর খুব কাছেই কোথাও স্টেশন আছে মনে হয়।
যেন বাঁশী বাজলেই ছুটতে হবে মালা হাতে করে....
অতিথিঠাকুরের দিকে।
ভাড়াটিয়া পাল্কী বেহারা
গড়ের বাদ্যি
লোকলস্কর
পুরোভাগে আমি।

অথচ সেই কবে তাঁর চিঠি পেয়ে গেছি ;
প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন—
এই যাত্রায় আমার গরীবখানায়
মহারাজ
আসবেনই না!

॥ ৩ ॥

ব্যাণ্ডপার্টি চলে গেলে
শেষ বাস আসবে ;
উঠে
ঘুমে জর্জর চোখে
ভর্তি পেটে টিকিট কাটলে
শেষ ঘড়িও বাজবে ;

তারপর
হত্যাকারীরা
আমাকে নিয়ে চোলো—
আমি আনন্দে নিহত হবো।

॥ ৪ ॥

এখনই তো সেইপথে চলে যাওয়া যায়
ছায়াপথে
যেখানে সপ্তর্ষির কড়া প্রহরায় তুমি জেগে আছো
মহারাজ।
মাথায় গাধার টুপি
চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল—

আমি তো তোমার কাছেই
বুদ্ধি আদায় করবো
তাই
যাত্রা করেছি।

॥ ৫ ॥

পা চালিয়ে চলতে পারলে
তাকে এখনও ধরা যেত।
কি যেন নাম!
ঘুমের মধ্যে সটান জড়িয়ে ধরে চুমু খান,
যে কোনো মোড় বেঁকলেই লোলুপ ঈশারা—

তিনি এখন
হাওড়া কলকাতার নরক ছাড়িয়ে
নাকি স্বর্গে
বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন।

আমি তাঁর কুকুরটাকে দেখেছি।

পা চালিয়ে চলতে পারলে
এখনও ধরা যেত
আধা শয়তান আধা ঈশ্বর
আমার সেই গুপ্ত প্রেমিকাটিকে।

॥ ৬ ॥

গড়িয়াহাটের ঠাসাঠাসি ভীড় থেকে
ছোটোবেলার
খুব কোনো বন্ধুকে
রাস্তা পেরিয়ে যেতে দেখা,
শরতের রবিবারে
ভিক্টোরিয়ার কালো পরীটার
বাঁশী বাজানোর
স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলা,
বৃষ্টির ফাঁকা ট্রামে
কতিপয় মানুষের মধ্যে
নিশ্চিন্ত যুবক যুবতী,
বালিগঞ্জের
কুমারী দুপুর জুড়ে
অলঙ্কারের মত
অনুরোধের আসরের গান,
অথবা আটটা রাতে
হঠাৎই হাঁটা পথে
গঙ্গা ঘাটের সেই ফুলের বাগান,
কলকাতার যেখান সেখান থেকে
ভালো ভালো স্বপ্নের মত
ভেসে ওঠা মাননীয় হাওড়ার ব্রীজ,

এমনই কত কি আরও
আমাকে যে

সুখের বড় কাছে নিয়ে যায়।
শিশুদের
সুখের কাছের সেই দারুণ দুপুর

সেখান থেকে
জননীরা, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবরা
আমাকে উদ্ধার করো

সন্তরণের শক্তি নেই

তবুও
অতিশয় সুখের পুকুরে
আমি যে
এমন করে
ডুবে গেলাম।

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবিতার চর্চা অনেক দিনের। সনেট কিংবা ট্রিওলেট লেখায় সুন্দর হাত। একদা একখানা কবিতার বইও বেরিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে গবেষণার কাজে ব্যস্ততার দরুণ সৃষ্টিকর্ম নিয়মিত হচ্ছেনা। তবুও সময় একটু অবসর দিলে পুরোন অভ্যেসকে ঝালিয়ে নিতে বেশি সময় লাগে না। কেননা পরিণত মানসিকতা নিয়ে তাঁর সাহিত্য সাধনা। নানান বিষয়ের ওপর কবিতা লেখেন। বিষয়ের ব্যাপকতা তাঁর কল্পনা শক্তিরই প্রমাণ। সব কিছুর মধ্যেই রুচিস্নিগ্ধ দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেন। কবিতার ক্ষেত্রে বক্তব্যে বিশ্বাসী, ফর্মের কাজ কারবার নিয়ে মাথা ব্যথা কম। কবিতা ছাড়াও প্রবন্ধ রচনায় সমান পারদর্শী। অতি সম্প্রতি লোক সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।]

ঘটা করে জন্মেছি কিন্তু বাঁচিনি কোনদিনই

মৃত্যুর আগে আমরা মরেছি বহুবার
ঘটা করে জন্মেছি কিন্তু বাঁচিনি কোনদিনই !
অথচ আশ্চর্য দেখো
তুমি আমি এবং আরো অনেকে
প্রতিদিন বাঁচবার ও মরবার অভিনয় করছি ।

ওই যে নিহত লাশটা পড়ে আছে
কোন একটা যুবকের, অথবা মানুষের
কিংবা কারো নয় ।
সে কি জন্মেছিলো অথবা তার মৃত্যু হলো ?

মৃত্যুর আগে আমরা মরেছি বহুবার
ঘটা করে জন্মেছি কিন্তু বাঁচিনি কোনদিনই !

এই যে আমি নামক মানুষটা, অথবা জীবটা
কিংবা কিছুই যে নয়
সে তো প্রতিদিন নিজেকে নিয়ে পালাচ্ছে, লুকুচ্ছে, বাঁচাচ্ছে !
অথচ সে পালাবে, লুকোবে বা বাঁচাবে কাকে ?
কারণ সে তো আদৌ জন্মায়নি !
মৃত্যুর আগে আমরা মরেছি বহুবার
ঘটা করে জন্মেছি কিন্তু বাঁচিনি কোনদিনই ।

গোপালপুর : সমুদ্র এবং কয়েকজন

জীর্ণ প্রাণ নাগরিক আর কিছু ক্লান্ত নাগরিকা
নগর উত্তাপে তপ্ত কিছু প্রাণ আজ পলাতকা,
চঞ্চল চলার ছন্দে জীবনের অর্থ খোঁজে নাকি ?
অসীম সমুদ্রে ওড়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি।

ঝাউবন বালিয়াড়ি আদিগন্ত সমুদ্র উদাস
ভগ্নগৃহ বেলাভূমে খেলাকরে বিষণ্ন বাতাস,
থেকে থেকে শোনা যায় হাহাকার অশান্ত ক্রন্দন
ঝাউবনে দীর্ঘশ্বাস লেগুনেতে জলের কম্পন।

জেলে ডিঙি ভাঙে ঢেউ তীরে জল সদাই মাতাল
মিতালী আকাশ-নীরে নীল নীল উথাল পাথাল ;
সার্ডিনের রৌপ্য রেখা শঙ্খচিল ডানা মেলে উড়ে
নির্জ্জন সমুদ্রে পূর্ণ কান্নাভরা এ গোপালপুরে।

ঝাউবন বালিয়াড়ী ঢেউভাঙে এখানে ওখানে
ক্লান্ত কিছু প্রাণ খোঁজে জীবনের অন্য কোন মানে

মৃত্যুর দুকাঁধে হাত দিয়ে

মৃত্যুর দুকাঁধে হাত দিয়ে
জন্মের মাটিতে পা রেখে
আমরা বাঁচবার চেষ্টা করছি।

অথচ আমরা জানি বা না জানি,
এটা তো ঠিক বাঁচাটা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক !

চারজন বাহক তোমাকে আমাকে
বহে নিয়ে চলেছে আরও অনেককে
কোন এক উদ্ধারণপুরের ঘাটে।

অথচ এটা তো ঠিক, তুমি আমি প্রত্যেকে
এসব জেনেও না জানার ভাণ করে
বাঁচবার মহলা দিচ্ছি প্রতিদিন।

চিতাটা সাজানো হয়েছে
দাউ দাউ আগুনের শিখাটা কাঁপছে
ফটাস্ ফট্—ফটাস্ ফট্
হাড় খুলি গুলো ফাটছে ত ফাটছেই।

অথচ আমরা ভাবছি ; বেশ আছি, ভালো আছি ;
পাশ বালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরে বাঁচবার চেষ্টা করছি

রূপসী বাংলা : সোনার বাংলা

পদ্মা দেখিনি, মেঘনা কিংবা দেখিনি ধলেশ্বরী
হিজলের বনে খেলা করে রোজ গাঙশালিকের সারি,
ধূ-ধূ বালুচর ভরা কাশবনে উদাত্ত জলরাশি
ভাটিয়ালি সুরে ভেসে আসা গান বাজায় উদাস বাঁশি

এখানে দেখেছি সুবর্ণরেখা শিলাই কংসাবতী
রুক্ষ নদীর সূক্ষ্ম ধারায় মৃদু বয়ে চলা গতি
কাঁকুরে মাটির শাল মহুয়ায় পলাশেতে লালে লাল
ঝুমুর বাউল ভাদু টুসু গানে মন সব উত্তাল।

মানিকপীর সত্যনারায়ণ চণ্ডী ধর্ম বেহুলাসতী
বোলান আলকাপ সারি জারি আর মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী
গাজন চড়ক মাঘমণ্ডল পিঠে পার্বন চন্দ্রপুলি
ওপার পদ্মা এপার গঙ্গা একেই আমরা বাংলা বলি।

নদীনালা ক্ষেত কাঁকুরে মাটি—শাল মহুয়ায় তোমার বেশ
ধানসিড়ি নদী রূপসী বাংলা ধন্য সোনার বাংলা দেশ।

নিয়ত নির্জন একা

নিয়ত নির্জন একা সমাহত সামুদ্রিক দ্বীপে
লবণাক্ত বিচ্ছিন্নতায় বেষ্টিত আমি ও প্রত্যেকে
ভাসমান; দ্বীপপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন এদিকে ওদিকে,
যত্রতত্র দৃশ্যমান পটভূমি মানব সমীপে।

অথচ আশ্চর্য এই প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা সদাই
রাজপথে গলিপথে জীবনের আনাচে কানাচে
শাণিত ফলাকাগুলো উল্লসিত হয়ে যেন নাচে,
বুভুক্ষু রক্তে নেশা কবে আমরা মেটাবো সবাই।

আরণ্যক নাগরিক সমাগত বৃক্ষের সমাজে
একক ব্যক্তিত্ব নিয়ে দণ্ডায়মান শতাব্দীর কাল
পাশব প্রবৃত্তি সহ তার মাঝে চতুষ্পদ পাল
পারস্পরিক সহনশীল সেথা নিত্য নিয়ম বিরাজে।

নির্জন বিচ্ছিন্ন একা দ্বীপপুঞ্জ আমরা সবাই
অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী অন্ধকারে পরস্পর আমরা সদাই॥

ছড়া

গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে
বাঙলা দেশের লক্ষ প্রাণে রক্ত কেন ঝরে ?

এপার গঙ্গা ওপার পদ্মা মাঝখানেতে চর
রক্ত দিয়ে দু-ভায়েতে ফাঁকটুকু আজ ভর।

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
মা বোনেরি ইজ্জত নিলো ভাইরে মারলো পিষে,

দলাদলি ভাগাভাগির অনেক দিলাম দাম
রক্ত দিয়ে রাখবো এবার বাংলা দেশের নাম।

দুটি ট্রিওলেট

॥ ১ ॥

বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারা নরম মাটিতে
মনের মাটি ভিজবে কবে সরস হবে বল ?
সুপ্ত যারা ব্যক্ত হলো প্রাণের বেদীতে ;
বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারা নরম মাটিতে।

সবুজ ঘাসে প্রাণের ধারা আজকে টলমল ;
প্রেমের ধারা কল্লোলিত জীবন তটিনীতে ;
বৃষ্টি পড়ে অঝোর ধারা নরম মাটিতে
মনের মাটি ভিজবে কবে সরস হবে বল ?

॥ ২ ॥

নীরব কেন মৌন কেন মনের গভীরে,
ফুলের ভাষা গোপন থাকে দলের আবরণে ;
যেমন বীজ সুপ্ত থাকে মাটির গভীরে
মৌন কেন নীরব কেন মনের ভিতরে।

ধূপের গন্ধ নীরব থাকে ধূপেই গোপনে,
গানের সুর গোপন থাকে ভাষার ভিতরে ;
নীরব কেন মৌন কেন মনের গভীরে,
ফুলের ভাষা গোপন থাকে দলের আবরণে।